ছোট গল্প

একটি ভাবগত বিপ্লবের মুখোমুখি

আনোয়ার শাহাদাত

পাবলিক লাইব্রেরী ভবনটির আকৃতি জাহাজের মতন, বিশাল জল জাহাজের মতন, ভবনটির অবস্থানের কোন দিকফিক নেই । দুটো রাস্তা দুদিকে গেছে লাইব্রেরীটাকে ফেঁড়ে, একটি কিসেনা বুলভার্ড অপরটি মেইন ষ্ট্রিট । ওই সে কথা - ওর কোন দিকফিক নেই, না পূর্ব-পশ্চিম না উত্তর-দক্ষিণ, বলা যায় কোনা-কানচি ধরনের। দুদিকের প্রসস্ত সিঁড়ি ধরে লাইব্রেরীতে ঢোকা যায় তা কিসেনা বুলভার্ড থেকেও, মেইন ষ্ট্রিট থেকেও । লাইব্রেরীর প্রধান সিড়ি ও মেইন ষ্ট্রিটের উল্টা দিকে নতুন ষ্টারবাকস্ কফি-শপ খুলেছে; সন্দেহ নেই বার্নস এন্ড নোবেল বইয়ের দোকানের মধ্যে যেভাবে এই কফি শপের শাখা থাকে সেই ধারনারই বিযুক্ত বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য পাবলিক লাইব্রেরীর উল্টাদিকে ওই ষ্টার বাকস্ কফির দোকান। এক কাপ কলাম্বিয়ান কফি পান করা হলেও হতে পারে যদি বা চায় কেউ এখানে, লাইব্রেরী, বইয়ের গন্ধ, পুথি পাঠ, কলাম্বিয়ান কফি ।

স্টার বাক্স কফি-শপের সামনে দাঁড়িয়ে প্যানারোমিক চোখে তাকালে এবং তাকিয়ে ওয়ালা যদি আমেরিকায় অভিবাসী হয় তাহলে প্রথমে তার চোখে পড়বে ওই পাবলিক লাইব্রেরীর গাঢ়ো ধুসর রঙ-এর সিড়ি, এবং সিড়িতে খোদাই করে লেখা প্রায় অর্ধ শ'খানেক ভাষার ছোট-ছোট সব বাক্য। স্বভাবতই নিউ ইয়র্ক তথা আমেরিকার "মোস্ট ডাইভার্সিফাইড"এলাকা বলে খ্যাত নিউইয়র্ক কুইন্সের এই ফ্লাশিং এর লাইব্রেরীর পাথর সিড়িতে খোদাই করে লেখা বাক্য গুলোর মধ্যে বাংলাও রয়েছে । অভিবাসী 'গলে যাওয়া সমাজ' যা কিনা 'মেল্টিং সোসাইটি' হিসেবে আখ্যায়িত এই শহরে, সেই ফ্লাশিং পাবলিক লাইব্রেরীর সিড়িতে 'বাংলা' যে বাক্যটি জ্বল-জ্বল করে গাঢ়ো ধুসর সিড়িতে তা হলো - "পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরী" ।

বাংলাদেশের "আদি সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদি' দলের নেতা জনাব ফরিদ উদ্দিন মাহতাব স্টার বাক্স কফি শপের সামনে দাঁড়িয়ে ওই বাংলা লেখা পাবলিক লাইব্রেরীর সিড়িতে "পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরী" দেখেন এবং পড়েন। ভেতরে 'খানিকটা'র চেয়ে অনেক অধিক আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন তিনি এবং মনে মনে একটি সংলাপও আওড়ান যে, "ভাষা হিসেবে বাংলার অগ্রযাত্রা কে রূধিবে এ ভুবনে", মনের ভেতরের সংলাপটি ছিল এ জাতীয় ।

ষ্টারবাক্স-এর সামনে থেকে সিড়ির উপর দিয়ে তাকালে রাস্তা কিসেনা বুলভার্ড পার করে চোখে পড়বে চশমার দোকানের সাইন "ক্রিয়েটিভ অপটিক্যাল", ভিয়েতনামিজ রেষ্টুরেন্ট "ব্যাংকো" তারপরে নাইন্টি-নাইন সেন্টের দোকান, যার পুরো সাইন বোর্ডটিতেই বড় করে লেখা রয়েছে ইংরেজী সংখ্যা হরফে "৯৯ সেন্ট ষ্টোর", তার পরে হার্ড ওয়ারের দোকান, এভাবে একটার পর একটা ।

ফরিদ উদ্দিন মাহতাবের সঙ্গী সোহরাব মাহমুদ টিপু ফরিদ উদ্দিনকে প্রথমে লাইব্রেরী দর্শনের প্রস্তাব করেন, স্টার বাক্স এর এক ডলার পঁচাশি সেন্ট দামের, আমেরিকাতে যা কিনা সবচেয়ে দামি চা বলে খ্যাত তা পান করাবার পরে। এবং সঙ্গী সাংবাদিকের প্রস্তাব মত তারা ফ্লাশিং পাবলিক লাইব্রেরীতে ঢোকে। "আদি সমাজতন্ত্র এবং সাম্যবাদি" দলের নেতা লাইব্রেরীর ভেতরে দেখেন, দেখে দেখে তিনি অভিভূত হন এবং আরো হতে থাকেন এর বিশালত্ব দেখে । এমন নয় যে এই প্রথম নেতা ফরিদউদ্দিন মাহতাব অভিভূত হচ্ছেন। তিনি এর আগেও কমছে-কম তিনাধিকবার আমেরিকায় এসেছেন এবং যথারীতি তখনও অভিভুত হয়েছেন, এখনও হচ্ছেন, এবং তিনি ধরেই নিয়েছেন যত বারই আমেরিকাতে আসবেন তত বারই এ দেশটির যাবতীয় জিনিষ দেখে অবাক এবং অভিভূত হবেন ।

ফ্লাশিং পাবলিক লাইব্রেরীর ভিন্‌দেশী ভাষার গ্রন্থ বিভাগে নেতার সংগী সোহরাব মাহমুদ টিপু নেতাকে নিয়ে গেলে তার আর এক দফা অবাক ও অভিভুত হওয়ার পালা শুরু হয় সারি-সারি, শত-শত বাংলা বইয়ের সংগ্রহ দেখে । আবারও নেতা আবেগাপ্লুত হন বাংলার অপ্রতিরোধ্য বিজয় দেখে ! (এখানে নেতার "কম মূল্যের" আবেগ প্রসঙ্গে স্বাধীনতা যুদ্ধ পূর্ব বরিশালের লঞ্চ ঘাটের বায়েস্কোপ ওয়ালা বিশ্বনাথের সেই বিখ্যাত সংলাপটি খুব যুৎসই মনে হচ্ছে তাহলো- "কি চমেৎকার দেখা গেছে", বিশ্বনাথ তার কবুতরের ঘরের মতন বায়োস্কোপ বাক্সে বাম বাহুতে ভর দিয়ে ডান হাতে ডুগ-ডুগি বাজিয়ে ফাঁকে স্লাইড বদলিয়ে দর্শকদের জন্য ওই রকম ছড়া বলতো "কি চমেৎকার লাইগা গেছে"), আবার নেতার অভ্যাস বশত সন্দেহও হয় এই ভেবে যে আমেরিকার মত জায়গায় কেনো তারা বাংলা বই রেখেছে। নেতার মনে হয় সেই সারা জীবনের ব্যবহৃত দলের ভেতর শত্রূর বিরুদ্ধে কথিত অপবাদ - যে শালা "সিআইএর এজেন্ট" এর কাজ নয়তো এই বই রাখা ! (এখানে আবারও প্রজোয্য "কি চমেৎকার দেখা গেছে") তার মনে হয় উহা নিশ্চয়ই সিআইএ'র কোন ষড়যন্ত্রের অংশ ! নেতার এ কথা মনে হওয়ার পর আবার নিজের প্রতিই একটু লজ্জা হয় অন্য কথা ভেবে যে তিনি সারা জীবনই ওই অপবাদ শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছেন মিথ্যা ও অন্যায় ভাবে, কেননা তিনি নিজেও সব সময় জানতেন যে দলের ভেতর তার এবং তার গ্রুপ থেকে অভিযুক্ত ব্যক্তি সিআইএ'র এজেন্ট দূরে থাক এমন কি দেশীয় সরকারের দালাল হওয়ারও যোগ্যতা নেই, তারপরও উপমহাদেশে বাম দলগুলোতে অন্তর্দলীয় শত্রু ঘায়েল করতে এর চেয়ে মোক্ষম অপবাদ আর কার্যকর হতে দেখা যায়নি । কিন্তু তিনি বাম রাজনীতির শুরু থেকেই জানতেন যে এ ধরনের অপবাদ প্রধানত মিথ্যা । তারা সিআইএ'র এজেন্ট খুঁজে পেতেন যতনা সিআইএ ঘেঁষা দলগুলোর মধ্যে তার চেয়ে বেশি নিজ বাম ঘেঁষা সিআইএ বিরোধী দলের মধ্যে ।

যাহোক, তার পর নেতা পরিকল্পনা করেন এই আমেরিকার লাইব্রেরীতে অভিবাসী বাঙালীদের পড়বার সুবিধার জন্য রাখা বইয়ের উপর তিনি ঢাকায় ফিরে কলাম লিখবেন। তিনি দৈনিক 'দিন-রাত' পত্রিকার নিয়মিত কলাম লেখক। তার মন্দ লাগে না যখন তার বক্তৃতার আগে তার সম্পর্কে বলা হয় যে "এবারে বক্তৃতা করবেন বিশিষ্ট কমিউনিষ্ট এবং বিশিষ্ট কলামিষ্ট জনাব ফরিদ উদ্দিন মাহতাব" (তারপর অডিয়েন্সের তালি এবং মুষ্ঠিবদ্ধ হাত তোলা অসহায় বিভ্রান্ত

শ্রমিক জনতার শ্লোগান - কমরেড তুমি এগিয়ে চলো আমরা আছি তোমার সাথে) । তিনি মনে মনে এই কলামের একটি নামও ঠিক করেন "বাঙালীর বিশ্ব ভ্রক্ষ্মান্ড বিজয়" সিরিজ - এক, দুই, তিন, চার, পাচ, ছয়, সাত, এভাবে চলতে থাকবে । তিনি আর ভাবতে পারেন না বিজয়ের এ গাঁথা তার কলামে কত সিরিজ পর্যন্ত যাবে, এই সংখ্যার গাণিতিক কোনো সীমা নির্ধারন না করে তিনি একটি অসীম সংখ্যার কথাই ভাবেন।

"আদি সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদি" দলের নেতার হাত সহসাই নিউ ইয়র্কের ফ্লাশিং লাইব্রেরীর বাংলা গ্রন্থের সংগ্রহের উপর চলে যায়। তিনি এমন ভাবে বই সমূহের উপর হাত বোলাতে থাকেন যেন ছেলেবেলায় তার বাবা যিনি বিশাল সরকারী কর্মকর্তা ছিলেন, দোনালা বন্দুক ও পাইক-পিয়াদা, মটর বাইক, লঞ্চ করে সুন্দর বনে শিকার শেষে তিনটে বড় হরিণ ও দুটো বাচ্চা হরিণ সহ ফিরে এসেছেন । কিশোর ফরিদ উদ্দিন মাহতাব সেই ছোট হরিণ দুটোর গায়ে পশমের উপর দিয়ে হাত বুলাচ্ছেন, আদর করছেন। বাংলা বইয়ের এ বিজয়ে (নেতার মতে) নেতার অভিভূত হওয়ার এই দৃশ্য এমন কিছু নিভৃত ঘটনা নয় বরং এর স্বাক্ষী নিউইয়র্কে তার ঐ দিনের সঙ্গী সোহরাব মাহমুদ টিপু । সাম্যবাদী নেতার এই আবেগাপ্লুত হওয়ার ঘটনা নিয়ে সোহরাব মাহমুদ টিপুও তাৎক্ষণিক পরিকল্পনা করে ফেলে যে সে একটি ফিচার লিখবে নিউইয়র্কের স্থানীয় বাংলা পত্রিকায়।

সোহরাব মাহমুদ টিপু নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত অনেকগুলো বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকার একটির প্রতিবেদক এবং ইতোমধ্যে 'তুখোড়' (!) প্রতিবেদকের নাম কুড়িয়েছে। অভিবাসী বাঙালীরা এই তুখোড় প্রতিবেদককে শ্রদ্ধার চোখেই দেখে থাকে, যেভাবে সাধারণ বাঙালীরা সাংবাদিকদের মহান মনে করে থাকে । প্রতিবেদক সোহরাব টিপু তার নিউ ইয়র্কের সাংবাদিক জীবনের সফলতা ও স্বীকৃতি অর্জন করেছে প্রধানত অভিবাসী বাঙালীদের ভেতরে 'কার বউ কার সংগে চলে গেল', 'পরকীয়ার নিষ্ঠুর পরিণতি', 'কার বধুয়া চলিয়া গেল কারইবা আঙ্গীনা ধরি', কিংবা 'বাঙ্গালী ললনা কৃঞ্চাঙ্গ যুবকের হাত ধরিয়া বাহির হইয়া গেল' ধরনের প্রতিবেদন রচনা করে । সোহরাব মাহমুদ 'জাত প্রতিবেদক', যাকে কিনা 'জাত সাংবাদিক' কি 'জাত লেখক' বলা যায়। লেখার জন্য তার হাত নিশ-পিশ করতে থাকে, এমনও ঘটেছে নিশ-পিশ করতে থাকা হাত নিরস্ত করতে হাতের পাতায় কাগজ-কলম ডলে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলেছে, তবুও থামানো যায়নি 'কার বউ কার সংগে চলে গেল' ধরনের ঘটনা ঘটে গেলে। কি করা, এতো সাংবাদিকতার কমিটমেন্টের মধ্যে পড়ে, বলে গেছেন মার্কস এমনটি! (কি চমেৎকার .....) । সে কথা এখানে আসেনা মার্কস কোথায় অথবা আদৌ বলেছেন কিনা সাংবাদিকতার কমিটমেন্টের মধ্যে কি পড়ে বা কি পড়ে না, তা এখানে বড় অপ্রাসংগিক। সাংবাদিক লেখার একটি ফরমও ভেবে ফেলেন কি ভাবে সাম্যবাদী নেতাকে নিয়ে এই আবেগাপ্লুত হওয়ার ঘটনাকে আরো অধিক স্পর্শকাতর করে তোলা যায়। হঠাৎ তার এও মনে হয় - তা দীর্ঘদিনের অভ্যাস থেকেই হয়তো, মনে হয় অন্য করো বউ সাম্যবাদী নেতার হাত ধরে চলে গেলে লিখতে জোসটা আরো বাড়তো অর্থাৎ কিনা প্রকৃত জোসিয়ান হয়ে 'কমিটমেন্ট' (!) থেকে একটা লেখা। সাংবাদিক মনে মনে একথা চিন্তা করে একটু হাসে, একটু লজ্জিতও হয় কেননা সন্মানিত এ নেতাকে জড়িয়ে অন্যের বউ চলে গেল কি বেরিয়ে গেল ধরনের, ভাবা ঠিক নয়। তবে এও ভাবে সাংবাদিক যে, সে রকমটি হলে তার লিখতে এমন কোন অসুবিধা হতো না কেবল একটি বাক্য জুড়ে দিলেই ব্যাপারটি বৈধতা পেয়ে যেত যে 'মার্কস বলেছেন'। এ সময় সাংবাদিকের এও মনে হয় যে সে যদি প্রকৃতই মার্কসের তত্ত্ব পড়ে দেখতে পারত তিনি কোথায় কি প্রসঙ্গে কি বলেছেন । তার কোনদিন মার্কস পড়া হয়নি অথচ বাম সাংবাদিক হিসেবে হাজার হাজার বার জীবনে লিখতে হয়েছে 'মার্কস বলেছেন' । সে যাক, কিন্তু এটা সাংবাদিক সোহরাব মাহমুদ টিপু নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে যে একটি অসাধারণ প্রতিবেদন সে রচনা করবে নেতার এই আবেগাপ্লুত হওয়ার দৃশ্য নিয়ে।

সাম্যবাদী দলের নেতার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অতি মাত্রায় প্রখর, সেও টের পায় সাংবাদিক তাকে পর্যবেক্ষণ করছে অতএব তার উচিৎ সাংবাদিকের পর্যবেক্ষণ করবার আরো সুযোগ করে দেয়া। তিনি তাই করেন, আরো আবেগ আনার চেষ্টা করেন, চোখের-মুখের ভাবখানা এমন করেন যেন সাংবাদিক লিখতে পারেন - তিনির (তার) দেশ-প্রেমের আবেগে চোখের কোনাখান-খানায় জল জমেছে, যেন জল-বন্যা! সাধারণত এরকম করেই তো লেখা হয়, তবে এটা নিশ্চিত এই ধর্মভীরু সাম্যবাদী কমিউনিস্ট নেতাকে ধর্মপ্রীত সাংবাদিক তার প্রতিবেদনে নেতার চোখের কোনে জল দেখার চেয়ে পানি দেখাটাকেই সংগত মনে করবে সন্দেহ নেই । কেনোনা তার ধারণা শব্দ ধর্ম-গোবরে লেজ মেখেছে । জল-পানিকে তার ধর্মীয় শব্দ মনে হয় । তো তার লেখায় নেতার চোখের 'জল-পানি' সাংবাদিকের লেখনীতে জম-জম কুয়ার পানির সংগে তুল্য করে জম-জম কুয়ার পানির মাহাত্ম ও ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে খানিকটা ধর্মীয় দায়িত্বও পালন করা যেতে পারে, যা কিনা ধমপ্রাণদের কর্তব্যের মধ্যেও পড়ে।

নেতা বই গুলো নেড়ে-চেড়ে দেখেন, মূলত দেখাতে থাকেন নিউ ইয়র্কের বাংলা কাগজের প্রতিবেদককে, দেশ-প্রেমের নমুনা ও দৃষ্টান্ত। বইগুলো নেতার মধ্যে দেশপ্রেমের বোধ আরো প্রবল জলোচ্ছাসের আকারে জাগায় । কিন্তু তিনি মুষড়ে পড়েন যখন কিনা দেখেন এই বইগুলো লাইব্রেরীতে সরবরাহ করেছে অন্য আর একটি দেশের মানুষের প্রতিষ্ঠান, তা হোক তারা বাংলায়ই কথা বলে, তবুও তারা তো অন্যদেশী, বাংলাদেশী নয় । ধর্ম প্রসঙ্গ না হয় বাদই থাক, সাম্যবাদী কমিউনিস্ট হিসেবে সে প্রসঙ্গ বাদ দেয়া উচিৎও বলে তিনি মনে করেন, কেনোনা ধর্ম একজন কমিউনিস্টের কাছে প্রধান বিষয় নয়, (কি চমেৎকার, কি চমেৎকার ....) যদিও কৃষ্টি হিসেবে জনসভায় সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের সেন্টিমেন্টকে সম্মান দেখানোর জন্যে দলের পোলিট ব্যুরো লোক দেখানো ধর্ম চর্চা অনুমোদন করেছে। দল মনে করে ধর্মীয় পোষাক-আষাক, আচার-আচরণ জনসাধারণের সন্তুষ্টির জন্য অনুসরণ করা যেতে পারে (বিশ্বনাথের কি চমেৎকার হা! আবারও এখানে এ প্রসঙ্গে) । প্যোলিট ব্যুরোর এই ঘোষণার আগে ও পরে আরো যে বাক্যটি সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে তা হলো- "মার্কস বলেছেন' (কি চমেৎকার!) । অতএব মার্কস বলেছেন শিরোনামে সাম্যবাদী দলের নেতাদের কল্কিদার কি শর্ষীণার অনুসরণে লম্বা পাঞ্জাবী এবং গোল টুপি পরে আস-সালামুয়ালাইকুম দিয়ে সাম্যবাদি দলের সভা শুরু করা অনুমোদিত হয় । প্রথম দিকে মওলানা ভাষানী ব্যবহৃত টুপিই প্রধান টুপি ছিল । এখন তার সরবরাহ কমে গেলে মক্কা-মদিনা অনুসরণে স্বর্ণালী বর্ণের সুর্যরশ্মি ঝলকানো জরির এ্যম্রেডারি করা গোল টুপি পরেই 'কৃষ্টি মাফিক' জনসভায় জনসাধারণকে সন্মান দেখানো হয় আদি সাম্যবাদি দলের জনসভায় ! তখন কারো কারো ভ্রম হয় সাম্যবাদি দলের নেতার ওই টুপি দেখে, বড় অচেনা লাগে সব কিছু, ঠাউরানো মুশকিল হয়ে পরে, বোঝা দ:ুস্যাধ্য হয়ে যায় ওই টুপিতে কে বা সাম্যবাদি, কে বা শর্ষীণার পীর ছাব বা মওলানা মান্নান কি আযমে গোলাম? উঠলে টুপি একবার কি নামে আর? য্যামন টুপি উঠেছিল

৩৫ পৃষ্ঠায় দেখুন

নিবন্ধ

পলাতক মানবতা

মীজান রহমান

মুফতি ওবায়দুল হক নঈমীর নাম হয়ত শোনেননি আপনারা। এবার শুনুন তাহলে। তিনি হুজুর মানুষ। পীরতুল্য মহাপুরুষ। তাঁর কাজ হল ফতোয়া দেওয়া। ফতোয়া দিয়েই তিনি নিজের ইহকাল ও অন্যের পরকালের ব্যবস্থা করেন। স্বয়ং আল্লাহপাকের কাছে সম্ভবত একটা হটলাইনের বন্দোবস্ত আছে তাঁর। বক্তৃতা করছিলেন খাজা গরীবে নেওয়াজের (রহ.) মিলন সভাতে। এই 'রহ' জিনিসটা কিসের সংক্ষেপ দয়া করে সেটা জিজ্ঞেস করবেন না আমাকে। পত্রিকায় যা লেখা আছে তাই তুলে দিলাম এখানে। না দিলে আবার কোন্ দোযখে যেতে হবে কে জানে। সভার সভাপতিত্ব করেছিলেন ইমামে আহলে সুন্নাত আন্নান নুরুল ইসলাম হাশেমী। না, এটা আরবদেশ নয়, বাংলাদেশ। এখানে কেউ আরবি বোঝে না, কিন্তু আরবি নাম রাখে এবং আরবি হরফের পাথরে কপাল ঠোকে। আমি দুটি আরবি নাম নিয়েই হিমশিম খাচ্ছি, জনাব যে এতগুলো আরবি নামের বোঝা কি করে সামলাচ্ছেন ভেবে তাজ্জব হই। সম্মেলনটা ছিল ইসলামী আলেমগণের। মুফতি নঈমী অনেক দামী দামী কথা বলার পর হঠাৎ বলে উঠলেন যে জনাব মতিউর রহমান নিজামী ও জনাব আলী আহসান মুজাহিদ কাফের হয়ে গেছেন। সভাস্থল স্তব্ধ। বলেন কি হুজুর? জামাত আন্দোলনের দুই বড় নেতা নিজামী আর মুজাহিদ, তাঁরা কাফের?

শুধু নেতাই নন তাঁরা, দেশের নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যও বটে। একজনের হাতে কৃষির ভার, আরেকজনের হাতে সমাজকল্যাণ। তাঁদের নাম যারা আজো শোনেনি এবার তাদের উচিত শিক্ষা হবে। নিজামী সাহেবের কথা আমি আগেও কিছু কিছু জানতাম, কিন্তু মুজাহিদ আমাকে বোকা বানিয়ে দিয়েছে। মনে হচ্ছে ভবিষ্যতে আরো অনেক মুজাহিদের নামই শুনতে হবে আমাকে। নিজামী সাহেবকে আমি অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে জানি না, তাঁর কীর্তির কথা জানি যৎসামান্য। তাঁর গ্রামের লোক কিন্তু তাঁকে মতিউর রহমান নিজামী হিসেবে চেনে না, চেনে 'মইত্যা রাজাকার' হিসেবে। এই নামেই তিনি পরিচিত গোটা পরগণাতে। মইত্যা রাজাকার যে কোন্ আলাদীনের জাদুবলে মাহামান্য মন্ত্রী মহোদয় হয়ে উঠলেন সে কাহিনী মোহন সিরিজের রহস্যোপন্যাসের মতোই রোমাঞ্চকর ও বিচিত্র। মন্ত্রি হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি নিজেই ফতোয়া দিয়ে বেড়িয়েছেন সবখানে। ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে তাঁর মুগুর আজকে তাঁর নিজের ওপরই পতিত হল। নঈমী সাহেবের অভিযোগ, মন্ত্রি হবার পর এই দুই পাপী শহীদ মিনার আর স্মৃতিসৌধে গিয়ে ফুল দিয়েছে, এমনকি হিন্দুদের দুর্গাপূজার মণ্ডপে গিয়েও পুস্পাঞ্জলী দিয়েছে। এতবড় অপরাধ কি ক্ষমা করা যায়? খোদার আরশ কেঁপে ওঠার কথা। পূজার মণ্ডপে পুস্প? হাজার তৌবাতেও তো এ পাপ মোছার নয়।

মইত্যা মিয়া যে ত্রিশ বছর আগে তার পাকিস্তানী প্রভুদের মণ্ডপে বাঙালীর মুন্ড অঞ্জলী দিয়েছিল সেটা অবশ্য কোন অপরাধই নয়। ঐ অপরাধের জন্যে জামাতী মুফতি দূরের কথা বাঙালী মুফতিরাও সাজা দিতে রাজী হয় নি। সাজাযোগ্য অপরাধ বলেই মনে করেনি কেউ। বিএনপি তো অবশ্যই নয়, আওয়ামী লীগও নয়। ২০০১এ তাদের সঙ্গে কোলাকুলি করেছে বিএনপি, ১৯৯৬-তে কোলাকুলি করেছিল আওয়ামী লীগ। সবারই যুক্তি, রাজনৈতিক চাল। আওয়ামী লীগ বলে রাজনৈতিক চাল, বিএনপি বলে রাজনৈতিক চাল। এমনকি জামাতও বলে রাজনৈতিক চাল। জাতির নেতারা বলে, পুরনো ঘটনা, মনে রাখতে নেই, একতার খাতিরে সব ভুলে যাওয়াই ভাল। ক্ষমা করে দিন। যারা কোনদিন ক্ষমা চায় নি তাদের ক্ষমার প্রশ্ন ওঠে কেমন করে সেটাই তো আমি বুঝি না। গোলাম আযম আর তার দলবল তো কোনদিন স্বীকারই করেনি যে একাত্তরে তারা কোন ভুল করেছিল। বরং তারা এখনো বলে জোরগলায় যে একাত্তর তো বটেই, এমনটি বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনটাও ছিল ভুল। তবু আমরা তাদের ক্ষমা করে দিয়েছি। অতীতের অন্যায়কে চুনকাম করে ঢাকতে চেয়েছি। ইহুদীরা কখনো চুনকাম করে নি। ষাট বছরের পুরনো আসামীকে এখনো খুঁজে বের করছে নানা জায়গা থেকে। কারো হচ্ছে ফাঁসি, কারো দ্বীপান্তর, কারো যাবজ্জীবন। আর আমরা আমাদের নাৎসীদের ধরে মন্ত্রীর আসনে বসাই। আমরা কি ক্ষমাশীল জাতি, না কেবলি মেরুদণ্ডহীন?

শত্রুকে মন্ত্রী বানালেই যদি মামলা চুকে যেত তাহলে বুঝতাম যে একটা উপকার হল। কিন্তু মামলা চুকার তো কোন লক্ষণই দেখছি না আমি। বরং জড়িয়ে যাচ্ছি আরো ফাঁসের মধ্যে। নিজামী আর মুজাহিদ যে শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ আর মন্দিরে গিয়ে ফুল দিয়ে এলেন তাতে যে কতখানি আন্তরিকতা ছিল সেটা ভেবে দেখার সাহস কি সত্যি সত্যি আছে আমাদের? মুফতি সাহেব যে ওদের কাফের ঘোষণা করে আমাদের চোখে ধূলো দেন নি সেটাই বা জানি কি করে।

মোট কথা ওদের কোন কাজই যে দেশের স্বার্থে করা হয় এটা আমি কখনো বিশ্বাস করব না। জামাতের রাজনৈতিক চাল বোঝার মত ঘিলু আমাদের নেই। ওদের নেতৃবর্গের দু'চারটে মন্তব্য থেকেই তার আভাস পাওয়া যায় খানিকটা। তারা বলছে, 'ধৈর্য ধরুন, ধৈর্য ধরুন। দূরপাল্লার যাত্রা এটা। আমাদের দিন আসবে।' দিন তো এসেই যাচ্ছে। সেবার আওয়ামী লীগের সঙ্গে যোগ দিয়ে তারা দুটো আসন পেয়েছিল সংসদে, এবার পেয়েছে সতেরোটা। অংকের হিসেব করে দেখুন কত পার্সেন্ট ওপরে সেটা। তাদের দৃষ্টি সামনে। এই দশকে না হলেও সামনের দশকে, কিংবা তারও পরের দশকে। তাদের পেয়ারা দেশ পাকিস্তান আবার ফিরে আসবে বাংলাদেশে। হয়ত পাকিস্তানের চেয়েও পবিত্র দেশ তৈরি করবে তারা। আফগান-তালেবান কিংবা স্বয়ং আরবদেশ। রাজনৈতিক চাল চালতে গিয়ে আমরা যে কি জালের মধ্যে আটকে যাচ্ছি সেটা বোধ হয় টের পাচ্ছি না আমরা। মাকড়সা যেমন তার সূক্ষ্ম জালের ভেতরে জড়িয়ে ফেলে অসহায় পোকাকে তেমনি করে ওরা জালবদ্ধ করছে আমাদের। একাত্তরের পরাজয়ের প্রতিশোধ তারা নেবেই।

ধাপে ধাপে এগুচ্ছে তারা। একটির পর একটি উদ্দেশ্য হাসিল হচ্ছে। ধীরে, সন্তর্পণে। ভারতকে শত্রু বানানো প্রয়োজন ছিল, আল্লার রহমতে সেটা প্রায় হয়ে গেছে। ভারতের সাহায্য ছিল বলেই তো পাকিস্তান হারল, জামাতের

হল এত অপমান। একাত্তরে ভারত ছিল বাংলাদেশীদের সবচেয়ে বড় বন্ধু। এখন হয়েছে সবচেয়ে বড় শত্রু। হা হা হা কি মজা কি মজা। একেই বলে তুরুপের তাস। ঘুঘু দেখেছ বাবা ফাঁদ দেখনি। এখন তো সাধারণ লোক ভারতের নামই শুনতে পারে না। এমন একটা ধারণা হয়ে গেছে ওদের যে দেশের সব অনিষ্টের মূলেই ভারতের হাত আছে। সাধারণ লোক কেন, তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদেরও একটা বড় অংশ এই ভারতবিদ্বেষের হুজুগে যোগ দিয়েছে। যারা ভারতের পক্ষ নিয়ে কথা বলতে সাহস পায় তারা হয়ে গেছে ভারতের দালাল, দেশদ্রোহী শত্রু। তারা হিন্দুভক্ত। তারা ইসলামবিরোধী, কাফের, নাস্তিক। এটাই সম্ভবত জামাতের দ্বিতীয় কর্মসূচি। দেশটাকে হিন্দুশূন্য করতে হবে। তার প্রস্তুতি কি এখনি শুরু হয়ে যায় নি?

নির্বাচনের ফলাফল বের হবার সাথে সাথে শকুনের দল বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। হিন্দুরা যে যেখানে আছে টেনে বের করছে। লাঠিপেটা করছে। মেরেও ফেলছে অনেককে। বাড়িঘর লুট করছে। তাদের মেয়েদের মায়েদের ধর্ষণ করছে। শত্রুপক্ষের নারীভোগ তো পাপ নয়। কেতাবেই সেটা জায়েজ করা হয়েছে। হিন্দুর চেয়ে শত্রু কি আছে দেশে? খুন কর তাদের। জ্বালাও তাদের মন্দির, পোড়াও তাদের বাড়িঘর, স্কুল হাসপাতাল। এই বর্বরতা হয়ত খালেদা জিয়া সমর্থন করেন না, বদরুদ্দোজা চৌধুরী আর সাইফুর রহমানও নিশ্চয়ই বরদাস্ত করার পক্ষপাতী নন, কিন্তু জামাতের প্রতিহিংসার উন্মত্ততা আর বিএনপি'র উশৃংখল ক্যাডার-মাস্তানদের পশুবৃত্তি বন্ধ করার ক্ষমতা কি তাদের আছে? নাকি আছে কোন আন্তরিক সদিচ্ছা? শুনছি বড় কর্তাদের নীতি হল সব অস্বীকার করে যাওয়া। সামান্য সাময়িক উত্তেজনা, তার বেশি কিছু নয়। শত্রুপক্ষের উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা। সাংবাদিকদের চক্রান্ত। ছবি তাহলে মিথ্যা কথা বলে। কেঁদে কেঁদে সারা হওয়া ধর্ষিতা কিশোরীর মুখ তাহলে মিথ্যে কথা বলে। ইউনিয়নের ইউপি সদস্য শেফালি সরকারের অসহায় সর্বহারা মুখ তাহলে মিথ্যে কথা বলে। অন্যের সন্ত্রাসে অতীষ্ঠ হয়েই যদি দেশবাসী ভোট দিয়ে থাকেন তাঁদের তাহলে নিজেদের সন্ত্রাসের প্রতি তাঁরা এত উদাসীন কেন প্রথম থেকেই।

রাজনৈতিক সুবিধাটা পাওয়ার সাথে সাথে সংখ্যালঘুর ওপর হামলা করার সেই পুরনো অভ্যেসটা বোধ হয় আমাদের যাবে না কোনোদিন। গত ষাট বছরের রক্ত দিয়ে লেখা ইতিহাস এই অভিশপ্ত উপমহাদেশটার, তবু যেন মিটল না ওদের রক্তপিপাসা। বারবার, বারবার, সেই একই যজ্ঞ, একই তান্ডব, একই রক্তের খেলা। সংখ্যালঘুর মত সহজ শিকার কোথায় পাবে তারা। সংখ্যালঘুর যৌবনবতী কুমারীর মত ভোগ্য কুমারী কোথায় পাবে তারা। সংখ্যালঘুর সম্পত্তির মত সহজলভ্য সম্পত্তি আর কোথায় পাবে তারা। তারা, আমরা, তোমরা, সবাই এই জরাগ্রস্ত বিকৃত বিকলাঙ্গ মানবগোষ্ঠী, আমরা মানসিকভাবে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত, দ্রুতক্ষীয়মান। সংখ্যালঘুর অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে যারা তাদের আক্রমণ করে তারা পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব। এই মূর্খ পশুদের বোঝার ক্ষমতা নেই যে সত্যিকার অর্থে সংসারে কেউ সংখ্যালঘু নয়, আবার সবাই সংখ্যালঘু। এক জায়গায় যারা সংখ্যাগুরু অন্য জায়গায় তারাই সংখ্যালঘু। আজকে আমরা, তথাকথিত মুসলমান বাংলাদেশীরা, যারা ক্যানাডা-আমেরিকায় এসে জীবনযাপন করছি, তারা তো নিদারুণভাবে সংখ্যালঘু এখানে। তাদেরই মুখাপেক্ষী আমরা যাদের নিয়মিতভাবে কাফের বলে গাল দিতে ভালবাসি। দেশের সংখ্যালঘুরা যে ব্যবহার পাচ্ছে সংখ্যাগুরুদের কাছ থেকে সেই ব্যবহারই যদি আমরা পেতে শুরু করি এখানে তাহলে কেমন লাগবে। সংখ্যালঘু শব্দটাই আমার কাছে আপত্তিকর মনে হয়। রীতিমত একটা গালের মত শোনায়, একটা অশ্লীল শব্দ। আজকের জগতে সত্যিকারের সংখ্যালঘু হল মনুষ্যজাতি। বিশেষ করে আমাদের দেশে। কত কোটি লোক সেখানে? তেরো কোটি তো ছিল সকাল বেলা। বিকেল বেলা সেটা কততে দাঁড়িয়েছে কে জানে। কিন্তু তার মধ্যে মানুষ ক'জন? তারা কোথায় গেল? এনডেঞ্জার্ড স্পিশিজ?

সংখ্যার রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের কতখানি সম্পর্ক জানি না। আধুনিক যুগের ধর্ম আর বিভক্তির রাজনীতি তো মূলত একই জিনিস বলে মনে হয় আমার কাছে। ষাট-সত্তর বছর আগে ধর্ম ছিল ধর্মেরই মত, অর্থাৎ একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। ওটা আত্মার বিষয় - পরম করুণাময়ের সঙ্গে মানবের সরাসরি সংযোগস্থাপনের একটা সুন্দর মাধ্যম। সে যুগে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানে খুব একটা তফাৎ ছিল না আমাদের দেশে। পরম শান্তি আর প্রীতির সাথে তারা বাস করত পাশাপাশি। ছোট বেলায় আমার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল জন্মাষ্টমীর মিছিল, সরস্বতীর মূর্তি আর কালীপূজার ঢাকঢোল ও নাচগান। হিন্দু ছেলেমেয়েরাও ছুটে আসত আমাদের মোহররমের মিছিল দেখার জন্যে, ঈদের সেমাই খাওয়ার জন্য। আমার বাবা পাঁচ-ওয়াক্ত নামাজ পড়া ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন, কিন্তু তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের বেশির ভাগই ছিলেন হিন্দু আর খ্রিস্টান। আমি কলেজে পড়ার আগ পর্যন্ত কোন মুসলমান ডাক্তার দেখিনি। বাবার অফিসের সহকর্মীদের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু, উকিল, পেশকার, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট - এঁরাও ছিলেন হিন্দু। এমনকি হিন্দু বাবুদের মত ধূতিও পড়তে দেখেছি বাবাকে মাঝে মাঝে। তাতে তাঁর ধর্ম নষ্ট হয় নি। আমাদের গ্রামের পাড়াতেও প্রচুর হিন্দু ছিল সেকালে। গ্রামের জেলে, মাঝি, কামার, কুমার, তাঁতী, বদ্যি, মাস্টার সবাই ছিলেন হিন্দু। হিন্দুরাই নিজেদের পয়সা খাটিয়ে গ্রামে গ্রামে স্কুল বসাতেন, দাওয়াখানা বানাতেন, এমনকি চওড়া রাস্তাঘাটও বানাতেন অনেক জায়গায়। তারপর চল্লিশ থেকে শুরু করে বিভক্তির রাজনীতি হৈ হৈ ধুমধাম। এদিকে আল্লাহুআকবার ওদিকে বন্দে মাতরম। জ্বালাও আগুন, পোড়াও মন্দির, ভাঙো মসজিদ, চালাও ছোরা-তরবারি। আজকে আমাদের গ্রামে একটিও হিন্দু পরিবার নেই, শহরের সেই পুরনো পাড়াতেও নেই কোন হিন্দু। এমনকি খ্রিস্টানরাও বিদায় নিয়েছে একে একে। দেশটাকে প্রায় আরবদেশের মত মরুভূমি বানিয়ে ফেলেছি আমরা। অমুসলমানের চিহ্ন থাকবে না কোথাও শিগ্‌গির। এটা কি স্বর্গ না নরক? ধর্ম ও স্রষ্টার সম্পর্কটাকে ভীষণ ধাঁধাঁর মত মনে হয় আমার কাছে। স্রষ্টা ছাড়া ধর্ম হয় না সেটা বুঝি, কিন্তু ধর্ম ছাড়া স্রষ্টার অস্তিত্ব না থাকার কোন কারণ আমি খুঁজে পাই না। বরং আমি বলব, গত পাঁচ হাজার বছর ধরে মানুষ যেভাবে ব্যবহার করে এসেছে ধর্মটাকে তাতে বিশ্বপ্রভুর জন্যে ধর্ম হয়ত একটা ভীষণ বিব্রতকর বস্তুই হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধর্ম তো একটা ব্যবসা মাত্র। তাও খুব সাধু ব্যবসা বলে মনে হয় না আমার কাছে। যে ব্যবসাতে কেবলি রক্তক্ষয় হয় সে ব্যবসা সাধু হয় কি করে? সাংগঠনিক ধর্ম আর সাংগঠনিক ক্রাইমের মধ্যে তফাৎ কিছু আছে কি?

খবর পাচ্ছি যে, নির্বাচন শেষ হবার সাথে সাথে আরো একটা বিষাক্ত সাপ বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে গর্ত থেকে। কবি শামসুর রাহমানের জীবনের ওপর হামলা হয়েছিল সেবার সেটা নিশ্চয়ই সবার মনে আছে। হরকতুল জেহাদ বা ঐ জাতীয়ই একটা অশ্লীল নাম মনে নেই ঠিক। সম্ভবত সেই একই দল বা তাদেরই ইয়ারদোস্তেরা হুমকি দিয়ে ফোন করতে শুরু করেছে শামসুর রাহমান, কবির চৌধুরী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের। অকথ্য ভাষায় গালাগাল করছে তাঁদের, জানমালের ভয়

দেখাচ্ছে। একাত্তরে একবার বুদ্ধিজীবী হত্যা করে হয়ত মূর্খরা ভেবেছিল এদেশে আর বুদ্ধিজীবী থাকবে না কোনোদিন। কিন্তু বুদ্ধি একটা জিনিস যেটা মানুষ ধর্ম থেকে পায় না, পায় একেবারে সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে। ওটাকে কখনো দমিয়ে রাখা যায় না। এমনকি আরবের মরুভূমিতেও বুদ্ধিজীবীর অভাব নেই। বুদ্ধিজীবী কারা? যারা সৃষ্টিধর্মী, যারা মুক্তচিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির সমর্থক, যারা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধিৎসা দিয়ে তাঁদের জ্ঞান ও বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ভিত্তিস্থাপনে প্রয়াসী। তাঁদের সঙ্গে ধর্ম ব্যবসায়ীদের যেন আজীবন বিরোধ একটা। প্রায় এক হাজার বছর ধরেই চলছে এই বিরোধ। আল্লাহরসুলকে মানতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তার একটা যুক্তি থাকতে হবে। শুধু ইমাম সাহেব বলেছেন বলেই আমাকে তথাস্তু বলে মেনে নিতে হবে ঐ যুক্তি আমার জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। বই পুস্তকে যা লেখা আছে সেগুলোর যৌক্তিকতা আর যথার্থতার প্রমাণ ছাড়া গ্রহণ করার বাধ্যবাধকতা বুদ্ধিজীবীরা স্বীকার করে না। সেটাই বোধ হয় তাদের অপরাধ। সাধারণ বুদ্ধিতে আমি জানি যে, গোপন রাখার মত কিছু থাকলেই মানুষ গোপন রাখতে চায়। ধর্মেরও এমন গোপনীয় কিছু আছে কিনা আমি জানি না কিন্তু ধর্মের সশস্ত্র পান্ডারা তো সেরকমই ব্যবহার করছেন। প্রশ্ন তুললেই ফতোয়া আসে। মুরতাদ, কাফের, খুন কর, কল্লা কাটো। বুদ্ধিজীবীদের কি এতই ভয় পায় তারা? গুমর ফাঁক করে দেবে?

দেশটার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব আশাবাদী হতে চাই আমি, কিন্তু মন থেকে তেমন সাড়া পাচ্ছি না। সরকার বদলালেই যে দেশের ভাগ্য বদলাবে সেই তত্ত্বে আমার আস্থা নেই খুব একটা। দেশের ভাগ্য বদলাতে মানুষকে বদলাতে হবে। অর্থাৎ মানুষকে মানুষ হতে হবে। তার কোন লক্ষণ দেখছি না এখনো পর্যন্ত। একটা উদাহরণ দেব। ছাত্রজীবনে এক প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। এমনই প্রগতিশীল যে সাম্যবাদী রাজনীতি করে জেল খেটেছিলেন ছাত্রাবস্থায়। জেল থেকে ছাড়া পাবার পরও তাঁর সরকারবিরোধী গোপন ক্রিয়াকর্ম অব্যাহত রেখেছিলেন বহুদিন। পূর্ব পাকিস্তানের বাম রাজনীতির জগতে তিনি ছিলেন এক আদর্শ ব্যক্তিত্ব। তাঁর বুদ্ধির প্রখরতা, দক্ষ নেতৃত্ব ও মতাদর্শের একনিষ্ঠতায় আকৃষ্ট হয়ে তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীই নিজেদের ভবিষ্যৎকে বিসর্জন দিয়ে বৃহত্তর জনকল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে প্রস্তুত হয়েছিল। লোকটির প্রতি আমার শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। বাষট্টিতে দেশ ছাড়ার পর তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয় নি। গুজবে শুনতাম তিনি সাম্যবাদের পথ ছেড়ে ধনবাদের পথ ধরেছেন। গতবার দেশে গিয়ে তাঁকে খুঁজে বের করলাম। তিনি আমাকে এক কাপ চা খাওয়ালেন দামী হোটেলে নিয়ে। নিজে খেলেন না, কারণ সেটা ছিল রোজার মাস। তিনি রোজা রাখছিলেন। কথা বলতে বলতে এক আশ্চর্য জিনিস বললেন আমাকে। শামসুর রাহমানের সেই ঘটনার উল্লেখ করাতে তিনি হো হো করে হেসে বললেন, ওগুলো সব মিথ্যে কথা। হরকতুল জেহাদ তাকে আক্রমণ করেনি, আক্রমণ করেছিল তার ঘরোয়া শত্রু। অর্থাৎ একটা পারিবারিক কলহের ফলাফল, আর কিছু নয়। যৌবনের সাম্যবাদী থেকে প্রৌঢ়ত্বের ধনবাদী, সেটা খুব বিচিত্র নয়, কিন্তু হরকতুল জেহাদকে পারিবারিক কলহ বলে উড়িয়ে দেবেন সেটা মোটেই আশা করিনি। অথচ তিনি এখনো মূল্যবান কলাম লেখেন পত্র-পত্রিকায়। সম্মানিত বুদ্ধিজীবীদের একজন। এবার বলুন দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী হব কেমন করে। ০

অটোয়া, কানাডা

নভেম্বর ১৯, ২০০১।

একটি ভাবগত ... ৩১ পৃষ্ঠার পর

একবার ঘাড় গড়িয়ে মস্তকে নামিছে কি তা আর একদা কমিউনিস্ট আযাদ সামাদের?

নেতা নিশ্চিত হন প্রতিবেদক সোহরাব মাহমুদ টিপুকে জিজ্ঞেস করে যে, যারা এই বই নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরীকে সরবরাহ করেছে তারা অন্যদেশী কিনা এবং ওই প্রতিষ্ঠানটি যে বা যারা পরিচালিত করে থাকে তারাও বাংলাদেশীদের ধর্মের বিপরিত ধর্মের কিনা। ধর্মের আবার বিপরীত ধর্ম! (বায়োস্কোপে বিশ্বনাথের ডুগডুগির সঙ্গে কি চমেৎকার লাইগা গেছে, খাপে-খাপ এখানে) । দিকের যেমন বিপরীত দিক, উত্তরের যেমন দক্ষিণ! পূর্বের পশ্চিম! বাংলাদেশের যে রাষ্ট্র ধর্ম আছে তারও যে বিপরীত ধর্ম আছে তা সাধারণ মানুষ না জানলেও এই সাম্যবাদী দলের নেতারা ঢের ভাল জানেন এবং তাদের অনুসারী প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সাংবাদিকরাও জানেন। এখানে এসময় সাংবাদিক বা নেতা কেউই বাংলাদেশের ধর্মের নাম নেয়না তবে আকারে ইঙ্গিতে এ ব্যাপারে বোঝা-পাড়া হয় দুজনের । আর সেই এখন অর্থাৎ তখন থেকে নেতার ভেতরটা দেশপ্রেমের আগুন ক্যালিফোর্নিয়ার মলিবু কি নিউ মেক্সিকো অথবা ফ্লোরিডার বন্য আগুনের মত সারা হৃদয় জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে । সারা পৃথিবীর বনগুলো দেশপ্রেমের আগুনে পুড়ে অংগার-ছাই করে ফেলতে ইচ্ছে করছে আদি সাম্যবাদী দলের নেতার । ইচ্ছে করে জনশুন্য প্রান্তরে কল্পিত জন জাগরণের বিশাল সামাবেশে শেখ মুজিবের সাত মার্চের ভাষণের কন্ঠের সবটুকু শক্তি দিয়ে বক্তৃতা দিয়ে জনগণকে বোঝাতে যে, এই হচ্ছে দেশ-প্রেম, এই হচ্ছে এই, এবং ইত্যাদি সব। সে খুব স্পষ্ট নয় এখন কি করে নিজের সুবিধা মত আবেগের ভাবনা দেশপ্রেমের সংজ্ঞার আওতাভূক্ত হয় । দেশপ্রেমের বিমূর্ত এই ধারণার অস্তিত্ব না থাকলে এই সংজ্ঞার তাত্ত্বিকগণ ও এই তত্ত্ব তরিকার পীর-ভাই সাম্যবাদী নেতাদের অসুবিধে যে হতো তা পরিস্কার হতে আর কোনো সন্দেহ থাকেনা । নেতার দেশপ্রেমের আগুনে তখন জ্বলছে ভারতের প্রদেশ ওয়েস্ট বেংগল থেকে আমেরিকা অভিবাসী পরিচালিত বাংলা বইয়ের সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান “মুক্ত বাণিজ্য ধারা” । দেশপ্রেম কিভাবে আগুনে পরিণত হয়, এবং সে আগুন কিভাবে তার রাষ্ট্র ধর্মের বিপরীত ধর্মের মানুষকে পুড়ে ছাই ভস্ম করে ফেলে তা উপলব্ধি না করতে পারলে বলা যায় ব্যর্থতারই এক ভয়াবহ নমুনা । এটাই যে মানব জন্মের প্রধান দ্বন্দ্ব ‘তা বলে গেছেন মার্কস’, (সাম্যবাদি দলের নেতারা শ্রমিকদের সামনে মার্কসের নাম নিতে কখনো ‘মার্কস ভাই’ বলে থাকে শ্রমিকদের বোঝাতে তারা যে মার্কসের কত কাছের লোক, যেমন সে সময়ের সাংবাদিকরা তাদের স্মৃতিচারণে শেখ মুজিবকে মুজিব ভাই বলে বোঝাতে চান তারা যে কত কাছের লোক ছিলেন বঙ্গবন্ধুর। শ্রমিকরা জানেনা কে জনাব কার্ল মার্কস আর কেই বা কে, তারা মার্কস সম্পর্কে ততটুকুই জানে যতটুকু হযরত মোহাম্মদ সম্পর্কে জানে, সবই আবছা-আবছা, ধোয়া-ধোয়া, ভাসা-ভাসা, শোনা কথা, অতএব সাম্যবাদি দলের নেতার কথায় শ্রমিকদের ধারণা হয় মোহাম্মদ ও মার্কস একই গোত্রভূক্ত দুজন) আদি সাম্যবাদী দলের নেতা ফরিদ উদ্দিন মাহতাব মার্কসের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, কেনোনা মার্কস হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি কিনা এই নেতার জীবনকে বুঝতে শিখিয়েছেন, ইত্যাদি সব বলে যেতে থাকেন নেতা । ০

গল্পটির বাকি অংশ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

নিউ ইয়র্ক

নভেম্বর, ২০০১।